স্বাধীনতার পর গত দেড় দশকে দেশ অনেকটা এগিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিশ^বাসীর নজর কেড়েছে। এত উন্নয়নের পরও কি কৃষক আনন্দে আছেন? উৎপাদন খরচের চেয়ে কমদামে বিক্রি করতে হচ্ছে উৎপন্ন ফসল। বাজারমূল্যের অক্টোপাসে ভোক্তা এখন অসহায়। অব্যবস্থাপনা সড়ককে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করছে। সুশাসনের অভাবে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে সন্ত্রাস শাখা মেলছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্য, শিক্ষাব্যবস্থা কাম্য সাফল্য দেখাতে পারছে না।

advertisement

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর শিক্ষা ক্ষেত্রের বহিরাঙ্গে পরিসংখ্যানের হিসাবে অগ্রগতি হয়েছে। প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা। কিন্তু চলমান বেতন কাঠামো উচ্চশিক্ষিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে পারছে না। একটি প্রকৃত শিক্ষিত জাতি গঠনে এ বাস্তবতাটি চরম হতাশাব্যাঞ্জক। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার মান কতটা ধরে রাখতে পারছে, তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। গত দুই দশকে বেসরকারি ও পাবলিক বিশ^বিদ্যালের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, কোনো কোনো বেসরকারি বিশ^বিদ্যালয় আন্তর্জাতিক রেটিংয়ে এগিয়ে থাকলেও পাবলিক বিশ^বিদ্যালয় এর ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনতে পারছে না।

আমাদের রাজনৈতিক আচরণের স্বার্থবাদিতা সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। অবস্থার বাস্তবতায় মনে হয়, সরকারিপক্ষ মনে করে জ্ঞানচক্ষুর উন্মিলন মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে। তাই শিক্ষিত গোষ্ঠী সরকারের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। এ কারণে দুর্বল করে রাখতে হবে শিক্ষা কাঠামোর ধারা। বিরোধী দল মনে করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মিলে একটি বড় জনগোষ্ঠীর বাস দেশে। যদি আন্দোলনের কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা হলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় সরকার ক্ষুব্ধতার মুখে পড়বে। এই নানাপক্ষের বিভিন্ন সমীকরণের কারণে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষাব্যবস্থা আর শিক্ষার্থী।

এগারো শতকে বিদেশি সেন বংশের রাজারা বাংলার সিংহাসন দখল করার পর প্রতিবাদী বাঙালিকে ভয়ের চোখে দেখেছে। তাই তারা চেয়েছে বাঙালির শিক্ষা ও সংস্কৃতির শক্তিকে দুর্বল করে দিতে। এই লক্ষ্যে শাসক গোষ্ঠী শূদ্র অভিধায় কোণঠাসা করে রাখা বাঙালিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিশূন্য করে ফেলতে চেয়েছে। তাই পাপ বলে প্রচার করেছে শূদ্রের বিদ্যাশিক্ষার অধিকারকে। অনেককাল পর পাকিস্তান আমল শুরুর পর্বে বাংলা ভাষার প্রতি শাসকদের বৈরী দৃষ্টির কারণও ছিল অভিন্ন। সংস্কৃতিশূন্য করে প্রতিবাদী বাঙালিকে নির্জীব করে ফেলতে চেয়েছে।

২০১৩-১৪ সালে বিএনপি আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করে অভীষ্টে পৌঁছার চেষ্টা করছিল। নেতৃত্বে হিসাবের ভুলে বিএনপির মতো একটি জনপ্রিয় দলকে এক সময় রাজপথ ছেড়ে চোরাগলিতে ঢুকে পরতে হয়েছিল। একটি গণতান্ত্রিক দলে নিজ আদর্শিক জায়গার স্খলন ঘটিয়ে জামায়াতের জঙ্গি ফর্মূলা গ্রহণ করেছিল। পেট্রল বোমা আর ককটেলে সাধারণ মানুষকে দগ্ধ করে সরকারকে চাপে ফেলতে চেয়েছে। নিজ দলীয় নেতানেত্রী আর সাধারণ মানুষকে এই দুর্বোধ্য আন্দোলনে মাঠে নামাতে না পেরে কিছুটা বেকায়দায় পড়েছিল বিএনপি নেতৃত্ব। দুই মাস ধরে হরতাল ও অবরোধ চালিয়েছে। দিনের হিসাবে রেকর্ড করা ছাড়া এই কর্মসূচি থেকে কোনো ফল লাভ করতে পারেনি। শুধু সর্বস্তরের মানুষের মনে তৈরি হয়েছে বোমা আতঙ্ক আর বিএনপি নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ। বিএনপির কর্মসূচিতে পুরো বিষয়টিই লেজেগোবরে হয়ে গিয়েছিল।

সাধারণভাবে জানা ছিল, সরকার পতনের মতো আন্দোলনের চূড়ান্ত ধাপ অবরোধ কর্মসূচি। জনগণের পূর্ণ সমর্থনে অবরুদ্ধ সরকার ধূলির ধরায় নেমে আসতে বাধ্য হবে। কিন্তু আমাদের চমকে দিয়ে বিএনপি নেত্রী আন্দোলনের গা গরমে না গিয়ে, কোনো ভূমিকা তৈরি না করে একেবারে উপসংহারে পৌঁছে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এভাবে জনগণ দূরের কথা, কর্মী-সমর্থকদের প্রস্তুত না করে অবরোধের ডাক দিয়ে দিয়েছিলেন। এতে যা হওয়ার কথা, সেটিই হয়েছিল। সরকার সক্রিয় অবস্থানে থাকায় অবরোধের ডাকে সাড়া মেলেনি। বাধ্য হয়ে

œ্রতকের ছাত্রের পুনরায় উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তির দশা হলো। অবরোধের ভেতর লাগাতার হরতাল চাপিয়ে দিতে লাগল বিএনপি। এমন গোঁজামিলের ফলও ভালো হয় না। দিনে দিনে হরতাল ও অবরোধের আবেদন বা ভীতি ফিকে হয়ে যেতে লাগল। রাজধানীতে প্রভাব শুরু থেকেই ছিল না। মাঝে মধ্যে চোরাগোপ্তা বোমা হামলা ছাড়া হরতাল বোঝার কারণ ছিল না। প্রথম দিকে ব্যবসায়ী আর কৃষকদের সংকট ছিল। বোমাভীতির কারণে দূরপাল্ল্রার পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল করতে পারেনি। ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাস আক্রান্ত হয়েছে। জনসমর্থন না থাকা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় দূরপাল্লার যানবাহন চলাচলও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। ফলে তখন চোরাগোপ্তা বোমা হামলা ছাড়া দৃশ্যত দেশে হরতাল ও অবরোধের তেমন প্রভাব দেখা যায়নি। এ অবস্থায় তখনো শেষ আক্রমণ ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি।

বিএনপি-জামায়াতের প্রথম থেকেই ছাত্রছাত্রীদের জিম্মি করা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আঘাত হানার দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। ২০১৪ সালের নির্বাচন ঠেকাতে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে শতাধিক স্কুলে আগুন দিয়েছিল বিএনপি-জামায়াত। রাজনীতির এসব আচরণে মনে হয়নি শিক্ষার উন্নয়ন দূরের কথা, স্থিতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রাখার দায়ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের তেমন নেই। ভুল পথে হেঁটে বিএনপি যে গহ্বরে পড়েছিল, এতদিনেও তা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারেনি (তবে আশার কথা, অতিসম্প্রতি সরকারের বেশকিছু দুর্বলতার সুযোগে বিএনপির আন্দোলনের গা গরম তৎপরতা বেশ চোখে পড়ার মতো)।

সরকারপক্ষও বিশ^বিদ্যালয়ে সুস্থ শিক্ষা পরিবেশ বজায় রাখার সুষ্ঠুনীতি নির্ধারণ করতে পারেনি, বিশ^বিদ্যালয় অঙ্গনকে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান সৃষ্টির চারণভূমি বানাতে সহযোগিতা করেনি। এর বদলে চেয়েছে নিজ দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখতে। দলীয় ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতির নীতিহীনতার কারণে জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে বিশ^বিদ্যালয়গুলোর বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। এর মধ্যে আঘাত হেনেছে কোভিড-১৯। প্রায় দুই বছর বন্ধ থেকেছিল সব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে বেসরকারি পর্যায়ের অনেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের টিকে থাকার মতো প্রয়োজনীয় প্রণোদনা নিয়ে সরকার এগিয়ে আসেনি।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর এসব মূল্যায়নে এক ধরনের হতাশা জায়গা করে নিচ্ছে। তবে আমরা অবশ্যই এ থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। সুস্থ পরিবেশে বেড়ে ওঠা বিশ^বিদ্যালয়গুলোয় মুক্তবুদ্ধির চর্চা হবে- এমনটিই প্রত্যাশিত। এ কারণে সবার আগে সরকারপক্ষকেই দীর্ঘদিনের অচলায়তন ভেঙে ফেলতে হবে। উপাচার্য থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনা থেকে বের হতে হবে। যথার্থ প-িত ও প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষ শিক্ষকদের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিলে এবং দলতান্ত্রিক বিবেচনা থেকে মুক্তি পেলে বিশ^বিদ্যালয়গুলো আবার জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হতে পারত। কিন্তু প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, দলীয় উপাচার্য দলীয় শিক্ষক বেষ্টনীতে থেকে দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় আর্থিক দুর্নীতির কথাও চাউর রয়েছে ক্যাম্পাসগুলোয়। এসব কারণে একদিকে মেধাবী প্রার্থীদের যেমন স্বপ্নভঙ্গ হয়, তেমনি কম মেধাবীদের ভারে ভারাক্রান্ত হয় শিক্ষার পরিবেশ। শিক্ষকদের নৈতিকতার জায়গাটি শক্ত না হলে অহঙ্কার করার আর কিছু থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মধ্যেও স্খলন রয়েছে। ক্লাস নেওয়ায় অনীহা রয়েছে অনেকের। তাদের অনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ অনেক সময় শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর আমরা এমন সব বিলাপ আর করতে চাই না। আমরা প্রত্যাশা করি, বিশ^বিদ্যালয়গুলো আপন মর্যাদায় ফিরে আসুক। তবে এমন প্রত্যাশার সাফল্য নির্ভর করছে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশ রচনার ওপর। ওপরিকাঠামো দেখলে মনে হবে বিশ^বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র রয়েছে। উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন হয়; সিনেট, সিন্ডিকেট ও ডিন নির্বাচন হয়। কিন্তু এসব ভোটেও নানা রকম শক্তি, প্রভাব, কৌশল ও প্রলোভনে ভোট নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা অমন অসুস্থ অবস্থা থেকে বের হতে চাই। তবে এই সত্য মানতে হবে যে, দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তি ছাড়া অমন নবজন্ম সম্ভব নয়। বিশ^বিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগে 'দলীয় বিবেচনা' শব্দযুগলকে বর্জন করতে হবে। জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার ক্যাম্পাস ও সংগঠনগুলোকেও পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। এসব সুস্থধারার পরিবেশ রচনা ছাড়া বিশ^বিদ্যালয়গুলোর বৈশি^ক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা কঠিন।

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়